রহস্যময় সমুদ্র

৮ জুন ছিল বিশ্ব সমুদ্র দিবস। বিশ্বব্যাপী নানান কর্মকাণ্ডে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব সমুদ্র দিবস। আমাদের জানা নেই জীবনের সঙ্গে সমুদ্র কতটা গভীরভাবে মিশে আছে। পৃথিবীর ফুসফুস বলা যেতে পারে সমুদ্রকে। কেননা আমরা বেঁচে থাকার জন্য যে অক্সিজেন গ্রহণ করি তার ৭০ ভাগ জোগান আসে সমুদ্রের নিচে উদ্ভিদগুলো থেকে। জাতিসংঘ সারাবিশ্বে ২০২১ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত সমুদ্র নিয়ে গবেষণা আর সামুদ্রিক পরিবেশ দূষণ রোধে কাজ করার লক্ষ্য নিয়েছে। এবারের জানা অজানা আয়োজনে আমরা সমুদ্র নিয়ে অজানা অনেক তথ্য জানানোর চেষ্টা করবো।

বিশ্ব সমুদ্র দিবস এলো যেভাবে

জাতিসংঘের উদ্যোগে ব্রাজিলের রিও ডি জেনোরিওতে ১৯৯২ সালে জাতিসংঘ পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক (ইউএনসিইডি) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনটি ধরিত্রী সম্মেলন নামে পরিচিত। বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলনে প্রতি বছর ৮ জুন বিশ্ব সমুদ্র দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে বছরই প্রথমবারের মতো দিবসটি পালন করা হয়। এরপর ২০০৮ সালে জাতিসংঘ বিশ্ব সমুদ্র দিবস পালনের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়। সমুদ্র বাঁচানো ও দূষণ রোধের বার্তা দিতে একটি বিশেষ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

অক্সিজেনের জোগান দিচ্ছে সমুদ্র

জেনে অবাক হতে পারেন পৃথিবীর প্রায় সবকিছুরই উৎস সমুদ্র। পৃথিবীতে মোট উৎপাদিত অক্সিজেনের ৭০ শতাংশই সমুদ্রের নিচে উদ্ভিদগুলো তৈরি করে। আমাদের নিশ্বাস সমুদ্রের ওপর নির্ভরশীল। পৃথিবীর ফুসফুসও বলা যেতে পারে এই সমুদ্রকে।

বিশ্ব সমুদ্র দিবসের থিম

প্রতিবছর বিশ্ব সমুদ্র দিবসে একটা থিম গ্রহণ করা হয়। গতবছর বিশ্ব সমুদ্র দিবসের থিম ছিল রিভাইটালাইজেশন। ২০২২ সালে নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠানটি হয়। যা বিশ্বজুড়ে সম্প্রচার করা হয়। সমুদ্রে অতিরিক্ত মাছ ধরা, বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, জলে তেল ছড়িয়ে যাওয়া; ইত্যাদি নানা কারণে ক্রমশ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সমুদ্র। দূষণ, উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে প্রবল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সমুদ্রের জীবজগত। যা প্রভাব ফেলছে মানবজীবনে। সমুদ্রের স্বাস্থ্য ফেরাতেই 'যৌথকর্মে সমুদ্র পাবে পুনরুজ্জীবন' প্রতিপাদ্য নিয়ে গতবছর বিশ্বজুড়ে পালিত হয়েছিল বিশ্ব সমুদ্র দিবস। ২০২১ সালের থিম ছিল 'সমুদ্র: জীবন আর জীবিকা'।

৩০০ কোটি মানুষ সমুদ্রের উপর নির্ভরশীল

পৃথিবীর জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ মানুষ সমুদ্রের ওপর নির্ভরশীল। পৃথিবীর ৩০০ কোটি মানুষ, জীবন ও জীবিকার জন্য সরাসরি সমুদ্রের ওপর নির্ভরশীল। পৃথিবীর ৫০ থেকে ৮০ শতাংশ জীব সমুদ্র ধারণ করে।

সর্ববৃহৎ জলপ্রপাত

যদিও পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ জলপ্রপাত বললে নায়াগ্রার কথা মাথায় আসবে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে গভীর সমুদ্রের তলদেশে একটি বিশাল জলপ্রপাত রয়েছে। যা পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম জলপ্রপাতেরর চেয়েও প্রায় ৪ গুণ বড়। তবে বিজ্ঞানীদের কাছে রহস্য হলো সমুদ্রের নিচে কিভাবে জলপ্রপাতের অস্তিত্ব বিদ্যমান। এর উত্তর তারা আজও জানতে পারেননি।

পৃথিবীতে সামুদ্রিক প্রাণীর সংখ্যা কত

পৃথিবীর সমুদ্র এবং মহাসমুদ্রগুলো বিজ্ঞানীদের ধারণার চেয়ে আরও বেশি সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যময়। ২০১২ সালে সামুদ্রিক প্রাণী বা জীবদের ওপর এক গবেষণায় ৮০টি দেশের ২৭০০ জন বিজ্ঞানী অংশ নেন। দশ বছর ধরে এ গবেষণায় খরচ হয় ৬৫ কোটি মার্কিন ডলার। এ গণনায় ক্ষুদ্র অণুজীব থেকে শুরু করে বৃহত্তম তিমি পর্যন্ত স্থান পেয়েছে। বিজ্ঞানীরা সামুদ্রিক জীবদের ভ্রমণ আচরণ নিয়ে গবেষণা করেছেন। এসব জীবের বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়া এবং খাদ্যাভ্যাসকে তারা তথ্যভাণ্ডারে যোগ করেন। যা 'ওসেন বায়ো জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম' নামে পরিচিত। প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার প্রজাতি সম্পর্কে দুই কোটি আশি লাখ প্রতিবেদন রয়েছে তাদের এই গবেষণায়। অন্যদিকে ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার অব মেরিন স্পিশিস তথ্যমতে, সারা বিশ্বের সমুদ্রে ২ লাখ ৩৬ হাজার ৮৭৮ ধরনের প্রাণী রয়েছে।

পৃথিবীর ৭০ ভাগ সমুদ্রবেষ্টিত

পৃথিবীর মোট আয়তন ৫১,০০৯৮,৫২০ বর্গ কিমি। পৃথিবীর স্থল ভাগের আয়তন ১৪,৮৯,৫০,৩২০ বর্গ কিমি (২৯%) আর পৃথিবীর জলভাগের আয়তন ৩৬,১১,৪৮,২০০বর্গ কিমি (৭১%)। পৃথিবীর ৭০ ভাগের বেশিই সমুদ্র দিয়ে বেষ্টিত। পৃথিবীতে বৃহত্তম ৫টি মহাসাগর। প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, আর্কটিক মহাসাগর এবং দক্ষিণ মহাসাগর। মহাসাগরগুলোর এ বিপুল জলরাশি আবার অনেকগুলো মহাসাগর ও ছোট ছোট সমুদ্রে বিভক্ত হয়ে গেছে।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণী থাকে সমুদ্রে

প্রাচীন কালে পৃথিবীতে চরে বেড়ানো সবচেয়ে বড় প্রাণী ছিল ডাইনোসর। কোনো কোনো ডাইনোসর প্রজাতি ১০-১৫টি হাতির ওজন ও

আকৃতির সমান ছিল। তাহলে ডাইনোসরই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণী? না, পৃথিবীর জীবিত প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রাণী হচ্ছে তিমি। নীল তিমি। নীল তিমি লম্বায় ১১০ ফুট, আর ওজন এক লাখ ৭৩ হাজার কেজি বেশি। এটা ২৫টি হাতির ওজনের চেয়েও বেশি। তিমির জিবের ওজন একটি হাতির সমান। (৩-৫ হাজার কেজি) তিমি যে বাচ্চা প্রসব করে, এর ওজন ২ হাজার ৭শ কেজি। ছোট পিগমি প্রজাতির তিমি রয়েছে। এদের দৈর্ঘ্য মাত্র ১১ ফুট। এগুলো গভীর জলের বাসিন্দা। তিমি বিশ্বের সব মহাসাগরে কমবেশি রয়েছে। তবে বঙ্গোপসাগরে এদের এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না। তিমি কত দিন বাঁচে এর নির্দিষ্ট সময়সীমা জানা নেই। প্রজাতি ভেদে এগুলো ৮০-১৩০ বছর বাঁচে বলে জানা গেছে।

বাংলাদেশের সমুদ্র

বাংলাদেশ সমুদ্র তীরবর্তী একটি দেশ। রয়েছে বিশাল ১,১৮,৮১৩ বর্গকিমি সমুদ্র সীমানা। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতটি পৃথিবীর দীর্ঘতম (১২০ কিমি)। অখণ্ডিত সমুদ্র সৈকতজুড়ে রয়েছে অজস্র প্রচীন ঐতিহ্য এবং দর্শনীয় স্থান। বাংলাদেশে ১৯টি সমুদ্র সৈকত রয়েছে। দ্বিতীয় দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত হচ্ছে বাঁশখালী। কুয়াকাটা দক্ষিণাঞ্চলের সৈকত যা পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় অবস্থিত।

বারমুডা ট্রায়াঙ্গল

বারমুডা ট্রায়াঙ্গলই সম্ভবত সাগরতলের সব থেকে আলোচিত রহস্য। ১৯৬৭ সালের ২২ ডিসেম্বর। মায়ামি থেকে বিলাসবহুল ইয়ট উইচক্র্যাফটে করে বাবা-ছেলে সাগরে পাড়ি জমালেন। কিন্তু তীর থেকে এক মাইল দূরে পৌঁছাতেই কোস্ট গার্ড কল পেলো যে, জাহাজটি কোনোকিছুর সাথে বাড়ি খেয়েছে, তবে বড় ক্ষতি হয়নি। কোস্ট গার্ড তখনই রওনা হয়ে গেল, ২০ মিনিটের মাথায় ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখা গেল, কিছুই নেই! কোনো চিহ্নই নেই জাহাজের! এভাবে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে অসংখ্য জাহাজ, নৌকা বা আকাশপথে যাওয়ার সময় বিমান রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা হলো 'ফ্লাইট নাইনটিন'। ১৯৪৫ সালের ৫ ডিসেম্বর ইউএস নেভির পাঁচটি যুদ্ধ বিমান রেগুলার মিশনে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। এরপর সেগুলোকে উদ্ধার করতে পাঠানো বিমানগুলোও রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যায়। বারমুডা ট্রায়াঙ্গল একটি ত্রিভুজাকৃতির জায়গা। যার এক পাশে রয়েছে ফ্লোরিডা, অন্যপাশে বারমুডা আর অন্যপাশে আছে সান জুয়ান, পুয়ের্তো রিকো। এর অন্য একটি নাম ডেভিল ট্রায়াঙ্গল। ৫০ বছরের বেশি সময়কাল ধরে এখানে প্রায় শতাধিক জাহাজ আর আকাশযান নিখোঁজ হয়েছে। গবেষকরা এই এলাকা নিয়ে নানারকম কথা বলেন, এলিয়েন, অতিমানবীয় শক্তি, চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাব, সময় পরিভ্রমণ কোনোটিই বাদ পড়েনি। এগুলোর মধ্যে সব থেকে গ্রহণযোগ্য ছিল অস্ট্রেলিয়ার একজন বিজ্ঞানীর দেওয়া বক্তব্য। তার ভাষ্যমতে, সাগরের ওই স্থানে হাইড্রোজেন সালফাইড আর মিথেনের আধিক্য দেখা যায়। এই গ্যাস চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং এতে পানির ঘনত্ব হ্রাস পায়। ফলে সহজে পানিতে যেকোনো কিছু ডুবে যায় আর আকাশযান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

জাপানের ডেভিল সি

প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের উপকূলের কাছেই এই 'ডেভিল সি'র ভৌগোলিক অবস্থান। বারমুডা ট্রায়াঙ্গল উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিমে। এটি জাপানের দক্ষিণে। এই সমুদ্র পথ দিয়ে গেলে আর কোনও জাহাজ নাকি ফিরে আসে না। উড়ন্ত বিমানও নাকি উধাও হয়ে যায়। না, বারমুডা ট্রায়াঙ্গল নয়। এ হলো জাপানের ড্রাগন ট্রায়াঙ্গল। এখানে নাকি অশুভ শক্তি বাসা বেঁধেছে! তাই একে 'ডেভিল সি' বলা হয়ে থাকে। জাপানের রাজধানী টোকিও থেকে ১০০ কিমি দূরে মিয়াকের কাছেই নাকি আজব সব ঘটনা ঘটে।

সেই পঞ্চাশের দশক থেকেই নাকি এখানে অসংখ্য জাহাজ উধাও হয়ে গিয়েছে। খোঁজ করতে গিয়েও আর নাকি ফিরে আসেননি কেউ। জাপান ও ফিলিপিন্সের সীমান্তে জাপানের ইয়োকাহামা থেকে ফিলিপিন্সের গুয়াম পর্যন্ত, গুয়াম থেকে মারিয়ানা, আবার সেখান থেকে ইয়োকাহামা পর্যন্ত এই 'মানো উমি' বা 'ডেভিল সি'-র ড্রাগন ট্রায়াঙ্গলে নাকি অশুভ আত্মারা রয়েছে, অনেকেই এমনটা বলে থাকেন। ১৯৫২-১৯৫৪ সাল নাগাদ নাকি পরপর বেশ কয়েকটি জাহাজ হারিয়ে যাওয়ার সময় প্রায় ৭০০ জন সৈন্যও গায়েব হয়ে যান। কারও নাকি আর খোঁজই মেলেনি। এ ছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও নাকি ৫০০টি বিমান, ১০টি যুদ্ধজাহাজ, ১০টি নৌ-যান ওই এলাকাতেই ধ্বংস হয় বা হারিয়ে যায়। একবার রহস্য সন্ধানে কায়ো মারু নামে একটি জাহাজ পাঠিয়েছিল জাপান। সেখানে নাকি বিজ্ঞানীরাই ছিলেন। কিন্তু রহস্যভেদ করতে গিয়েও তারাও আর ফিরে আসেননি। ৩১ জন বিজ্ঞানীর খোঁজ না মেলার কথা রটে যাওয়ার পর থেকেই অনেকেই বলতে থাকেন সমুদ্রের তলদেশে নাকি ড্রাগন রয়েছে। সেই থেকে নাম 'ড্রাগন ট্রায়াঙ্গল'। তবে ঠিক কবে থেকে ডেভিল সি-'র এই অংশকে 'ড্রাগন ট্রায়াঙ্গল' বলা শুরু হল, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত এই এলাকার সঠিক চিহ্ন কোনো মানচিত্রে না থাকলেও নাবিকরা তা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে।

সমুদ্রে দৈত্যাকৃতির ওরফিশ

ওরফিশ দেখতে সাপ আকৃতির। ওরফিশ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হাড়যুক্ত মাছ। লম্বায় প্রায় ৫৫-৬০ ফুট পর্যন্ত হতে পারে; ওজন প্রায় ৬০০-৬২০ পাউন্ড। মাছগুলো সমুদ্রের গভীরতম অংশে বাস করে। সমুদ্র জলরাশির উপর থেকে তলানির দিকে কমপক্ষে ২শ থেকে ১ হাজার মিটার জলের নিচে এ প্রাণীটি বসবাস করে। এই গভীরতার প্রাণী সম্পর্কে আমাদের খুব বেশি ধারণা নেই। ২০১৩ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার সি বিচে দুটি মরা মাছ খুঁজে পান বিজ্ঞানীরা। সেই থেকেই এই মাছ সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানীরা এখনো এর প্রজাতি সম্পর্কে কিছুই জানেন না।

পৃথিবীর সবচেয়ে গভীরতম খাত

মারিয়ানা ট্রেঞ্চ প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত; যা পৃথিবীর সবচেয়ে গভীরতম অবস্থান। এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন অনুসারে ট্রেঞ্চ এবং এর সম্পদের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এখতিয়ার রয়েছে। স্পেনের রাজা চতুর্থ ফিলিপের রানি ছিলেন মারিয়ানা। তার নামেই নামকরণ হয়েছিল প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের। ষোড়শ শতকে সেগুলি ছিল স্পেনীয় উপনিবেশ। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম অংশে এই দ্বীপগুলি আসলে ডুবে থাকা কিছু ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির চূড়া। এই দ্বীপপুঞ্জ থেকে ২০০ কিমি পূর্বে বিস্তৃত বিশ্বের গভীরতম মহাসাগরীয় খাত। ২৫৫০ কিমি লম্বা এবং ৬৯ কিমি চওড়া এই সামুদ্রিক খাতের নাম দেওয়া হয়েছে নিকটবর্তী দ্বীপপুঞ্জের নামেই। ফলে গভীরতম খাত 'মারিয়ানা ট্রেঞ্চ'-এর পরিচয়ের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে স্পেনের রানির নাম। সমুদ্র বিজ্ঞানীদের গবেষণায় জানা গিয়েছে এই খাতের গভীরতম অংশের মাপ ১০,৯৮৪ মিটার। মারিয়ানা ট্রেঞ্চের গভীরতম এই অঞ্চলের নাম দেওয়া হয়েছে চ্যালেঞ্জার ডিপ। এর গভীরতা বোঝানোর জন্য বলা হয়, যদি মাউন্ট এভারেস্টকে এর মধ্যে বসিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে আরও প্রায় ২ কিমি মতো জায়গা বাড়তি পড়ে থাকবে। অর্থাৎ পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গের থেকেও আয়তনে বড় বিশ্বের গভীরতম খাত।

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবার মারিয়ানা ট্রেঞ্চের গভীরতা মাপে ব্রিটিশ জাহাজ এইচ এম এস চ্যালেঞ্জার। পরে বহুবার বিশ্বের গভীরতম খাত নিয়ে গবেষণা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে এর গভীরতা সংক্রান্ত তথ্য। মারিয়ানা ট্রেঞ্চের গভীরে পৌঁছতে পেরেছেন মাত্র নগণ্য সংখ্যক অভিযাত্রী। প্রথম দুই অভিযাত্রী ছিলেন জাক পিকার্ড এবং মার্কিন নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট ডন ওয়ালশ। ১৯৬০ সালে মার্কিন নৌসেনার 'ব্যাথিস্কেপ' জলযান করে এই দুই দুঃসাহসী পৌঁছেছিলেন মারিয়ানা ট্রেঞ্চের গভীরে। ডুবোজাহাজের সঙ্গে এর অনেকটাই বৈসাদৃশ্য আছে। সুইস ও ইতালীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত ব্যাথিস্কেপ 'ত্রিয়েস্ত'-এর সাহায্যে বিশ্বের গভীরতম বিন্দুতে অভিযান চালিয়েছিলেন এই অভিযাত্রী জুটি। পাঁচ ঘণ্টা ধরে অবতরণের পরে গন্তব্যে পৌঁছতে পেরেছিলেন পিকার্ড এবং ওয়ালশ। কিন্তু চ্যালেঞ্জার ডিপ-এর গভীর বিন্দুতে থাকতে পেরেছিলেন মাত্র কুড়ি মিনিট। তারা ১০,৯১৬ মিটার অবধি নামতে পেরেছিলেন। প্রথম অভিযানের পরে অর্ধশতক পেরিয়ে ২০১২ সালে ফের মানুষের অবতরণ মারিয়ানা খাতে। এ বার সাব-ডাইভ দেন চিত্র পরিচালক জেমস ক্যামেরন। তিনি পৌঁছতে পেরেছিলেন ১০,৯০৮ মিটার অবধি। সম্প্রতি ভিক্টর ভেসকোভো পৌঁছেছেন ১০,৯২৭ মিটার অবধি। তিনি প্রথম অভিযাত্রীদের রেকর্ড ভাঙতে পেরেছেন।